ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর ফিরে দেখা ইতিহাস

আসজাদুল কিবরিয়া

মহান ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছরে প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় চোখ বোলানো খুব সহজ কাজ নয়। ইতিহাস বিকৃতি ও ইতিহাস বিভ্রান্তি যেভাবে আমাদের দেশে গেড়ে বসেছে তার ভেতর থেকে সঠিক ধারাটি চিহ্নিত করাও বেশ কঠিন। তবু ইতিহাসকে জানার তাগিদে সংক্ষিপ্তভাবেও হলেও আমরা ফিরে দেখার চেষ্টা করব।

আদি পর্ব

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর বাঙালী মুসলমান ও হিন্দুর ভেতর বেশ কিছু পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাভাষার তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনার বিচ্ছিন্ন প্রকাশ ঘটছিল তখন থেকেই। ১৯১৮ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে ভারতের সাধারণ ভাষা বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ঐ সভাতেই ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হিন্দি, উর্দুর পাশাপাশি ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯২১ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক লিখিত প্রস্তাবে বাংলা ভাষাকেই বাংলা অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। ১৯৩৭ সালের ২৩ এপ্রিল মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদ পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বপক্ষে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। বস্তুত চল্লিশ দশকের এই সময়টাতে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে কি হবে না সে নিয়ে একটা তর্ক জমাট বাধঁতে থাকে। তবে দেশ বিভাগ নিশ্চিত হয়ে গেলে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রভাষা হিন্দির বিপরীতে উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আজাদ পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ জানান। আরো কয়েকজনও এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন। জুলাই মাসেই ঢাকায় গণ-আজাদী লীগ নামে একটি সংগঠন তাদের ঘোষণায় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা উল্লেখ করেন। কমরুদ্দীন আহমদ ছিলেন এই সংগঠনের আহবায়ক। মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের সেই ক্রান্তিলগ্নে আবদুল হক, মাহবুব জামাল জায়েদী, আবুল মনসুর আহমদ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, এনামুল হক, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল কাসেম, কবি ফররুখ আহমদসহ খ্যাত-অখ্যাত অনেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে লেখালেখি করতে থাকেন।

দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় তমুদ্দন মজলিশ- ১ সেপ্টেম্বর যার আত্ম প্রকাশ ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম আরো কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে এ সংগঠনটি গড়ে তুলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর তমুদ্দন মজলিশ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এতে অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদের তিনটি প্রবন্ধ ছিল। ৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের এক সভায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ঐ সভাতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যাপক আবুল কাসেম, সানাউল হক, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, সত্যব্রত বসু, সৈয়দ নুরুদ্দীন, নূরূল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন ও আরো অনেকে তাতে যোগ দেন। ১৩ নভেম্বর তমুদ্দন মজলিম ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে এক সভার আয়োজন করে যেখানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার। উদ্বোধন করেন তৎকালীন সচিব নুরূল আমিন। কৃষি সচিব সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, আবুল হাসনাত, ড. এনামুল হক, কবি জসিমউদ্দিন, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, শ্রীযুক্তা লীলা রায় সহ আরো অনেকেই এতে যোগদান করেন।

'৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের করাচীতে শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এক সভা হয় যাতে মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান চৌধুরী, কল্যান দাশ গুপ্ত, একেএম আহসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভিপি ফরিদ আহমদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিসহ কয়েকটি প্রস্তাব পাঠ করেন। সভাশেষে ছাত্ররা মিছিল বের করে সচিবালয়ে যায় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী মুহম্মদ আফজল, নূরূল আমিন ও হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাত করে। পরে ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে যেয়ে স্যাাৎ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সেটাই ছিল প্রথম প্রকাশ্য সভা ও মিছিল।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচীতে গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের ৩য় দিনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত পূর্ব-বাংলার সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব দিলে তা অগ্রাহ্য হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন নইমুদ্দীন আহমদ, মুহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ ছাত্র-নেতা। ২ মার্চ ফজলুল হক হলে কমরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে এক সভায় আবুল কাসেম, রণেশ দাস গুপ্ত, আজিজ আহমদ, অজিত গুহ, সরদার ফজলুল করিম, শামসুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, নইমুদ্দীন আহমদ, তফাজ্জল আলী, শামসুল আলম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলিখান , তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় শামসুল আলমকে আহবায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। অবশ্য এর আগে অধ্যাপক নুরূল হক ভূইয়াকে আহবায়ক করে পরিষদ গঠনের কথাও বলা হয়েছে। তবে এ সভাতেই সিদ্ধান্ত হয় যে ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হবে।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মত ১১ মার্চ প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকায়

সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। কিছু ছাত্র হাইকোর্টের গেটের সামনে পিকেটিং করে। তারা উকিলদেরকে আদালত বর্জনের জন্য বলতে থাকে। এমতাবস্থায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সহ অনেক আইনজীবীর সঙ্গে ছাত্রদের তর্কাতর্কি হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করলে তার প্রতিবাদে আইনজীবীরা স্বেচ্ছায় আদালত বর্জন করেন।

সচিবালয়ের সামনে পিকেটিং আরম্ভ করলে পুলিশ এখানেও ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এই লাঠিচার্জে ফজলুল হকও আহত হন। পিকেটিংয়ের প্রথম পর্যায়ে গ্রেপ্তার হন শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী প্রমুখ।

দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নঈমুদ্দীন আহমদ।

১১ মার্চের ধর্মঘটের দিন সরকার ও মুসলিম লীগ দলের উস্কানিতে ছাত্রদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৩ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৫ মার্চ ঢাকায় ছিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম সভা। ওই দিন সকালে পূর্ব বাংলা পরিষদের সদস্য বগুড়ার মুহম্মদ আলী এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রাইভেট সেক্রেটারি খাজা নসরুল্লাহ এসে হাজির হন সংগ্রাম পরিষদের নেতা কমরুদ্দীন আহমদের বাসায়। তারা বলেন যে নাজিমুদ্দীন ওই দিনই পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কমরুদ্দীন আহমদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী ওরা বর্ধমান হাউজে নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনার জন্য উপস্থিত হন। বৈঠকে নাজিমুদ্দীনের সঙ্গ সংগ্রাম পরিষদ প্রতিনিধিদের তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দীন পরিষদের দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি সম্পাদনে রাজি হন।

ঢাকায় জিন্নাহ : বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসে। ২১ মার্চ বিকেল বেলা ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়াদী পার্ক) জিন্নাহকে এক নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বক্তৃতায় এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এই পর্যায়ে ময়দানের শ্রোতাদের মধ্য থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে না না ধ্বনি ওঠে।

২৪ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন্নাহর সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে। কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এ সমাবর্তনে তিনি তার বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে রেসকোর্স ভাষণের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা প্রদেশবাসী স্থির করবেন। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এই বক্তব্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ছাত্র নো নো (না, না) বলে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান। আব্দুল মতিন সহ আরো কয়েকজন প্রতিবাদ করেছিলেন। আর ছাত্রদের প্রতিবাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে বাকি সময়ের বক্তব্যে জিন্নাহ বলেন, তাঁর মতে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে।

যা হোক অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ওই দিনই সন্ধ্যার দিকে জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আবুল কাসেম, শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, শামসুল আলম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং লিলি খান। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জিন্নাহর কাছে পেশ করা হয়। এবং আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

জিন্নাহর ঢাকা ত্যাগের আটদিনের মাথায় ৬ এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ভাষা সংক্রান্ত দু'দফার একটি প্রস্তাব আনলেন। তাতে বলা হলোঃ পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে এবং যত শিগগিরই বাস্তব অসুবিধাগুলো দূর করা যায় তত শিগগিরই কার্যকর করা হইবে। পূর্ব বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ স্কলারদের ভাষা।

স্পষ্টতই এ দুদফা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

এদিকে ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকা। এটি ছিল তমুদ্দম মজলিশের মুখপত্র। সৈনিক আমাদের ভাষা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া উল্লেখ্য সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ও সাপ্তাহিক নও বেলাল পত্রিকা। এরা ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক ছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা সরকার রাষ্ট্রবিরোধী অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের এক মিথ্যা অভিযোগ ভাষা আন্দোলনের সমর্থক একমাত্র দৈনিক দ্য পাকিস্তান অবজারভার প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৮ সালেই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম মাঠে এক ছাত্রসভায় সমগ্র ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দাবি রউল্লেখ ছিল। স্মারকলিপিটি প্রণয়ন করেছিলেন সলিমুল্লাহ হলের তদানীন্তন ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরী। আর সভায় পাঠপূর্বক প্রধানমন্ত্রীকে তা প্রদান করেন তদানীন্তন ডাকসু জিএস গোলাম আযম।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিন্তু অব্যাহত ছিল। এরই অংশ হিসেবে আরম্ভ হয় বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলের উদ্যোগ। এই চক্রান্তের প্রধান ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান।এছাড়া মওলানা আকরাম খাকে সভাপতি করে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি আরবি হরফ প্রচলনের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়।

১৯৪৮ সালে যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ১৯৪৯ থেকে প্রতি বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্র ভাষা দিবস পালিত হত। কিন্তু ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন উপলক্ষে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৯৫১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলা সরকারকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ১১ মার্চ ছিল রাষ্ট্রভাষা দিবস। ওই দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে। বেলা বারোটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় একটি ছাত্রসভা। সভাপতিত্ব করেন খালেক নেওয়াজ। বক্তব্য রাখেন হাবিবুর রহমান শেলি, বদিউর রহমান, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, আবদুল মতিন, সিদ্দিক আহমদ ও মুখলেসুর রহমান। ওইদিনই ছাত্রনেতা আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমেই সুচনা হয় ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বের।

১৯৫২: চূড়ান্ত পর্বের শুরু

১৯৫২ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে পাকিস্তানের নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় আসেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় তিনি পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তার ভাষণে তিনি ১৯৪৮ এর মার্চে জিন্নাহ প্রদত্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তির করে ঘোষণা করেন প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা প্রদেশবাসীই স্থির করবেন কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। নাজিমুদ্দীনের এই ঘোষণায় তীব্র বিক্ষোভ প্রতিবাদের সূচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ওই দিন আমতলায় অনুষ্ঠিত

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা নাজিমুদ্দীনকে '৪৮ এর সম্পাদিত চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন ও তা রক্ষার দাবি জানান।

ভাষা আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ৩১ জানুয়ারি বিকেলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে কাজী গোলাম মাহবুব ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরি হলে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সভায় ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রবাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, আবুল কাসেম, আবদুল গফুর, কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, খালেক নেওয়াজ খান, মির্জা গোলাম হাফিজ, গোলাম মাওলা, আবদুল মতিনসহ আরো অনেকে। ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুব সাফল্যের সঙ্গে ধর্মঘট পালিত হয়। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভায় ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর একটি অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হবে।

৪ ফেব্রুয়ারির পর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৬ ফেব্রুয়ারির সভাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিন ১৫০নং মোগলটুলীতে পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবির অফিসে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সঙ্গে পালনের জোরালো মত ঘোষিত হয়। একই সঙ্গে ১১ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালনেরও সিদ্ধান্ত হয়। পতাকা দিবস পালন করা হয়। এই পতাকা দিবসকে উপলক্ষ করে আরো অনেক নতুন কর্মী ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ওই সময় নাদিরা বেগম ও ডা. সাফিয়া তাদের বান্ধবীদের ও অন্যান্য ছাত্রীদের নিয়ে পাঁচশো পোস্টার লিখেছিলেন।

এদিকে ২০ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঢাকায় এক নির্দেশ জারি করেন। নির্দেশে বলা হয় যে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারার আদেশ জারির মাধ্যমে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মাইকে যখন এই ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে তখন ৯৪ নবাবপুর রোডে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে বসেছে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক। সভাপতিত্ব করছিলেন আবুল হাশিম। পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরোধিতা করেন। আবুল হাশিম, কমরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, প্রখুম ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে যুক্তি দেখান। কিন্তু অলি আহাদ ও আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে জোরাল সর্মথন দেন। এদিকে যখন সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক চলছে , তখন অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রকর্মীরা স্বতন্ত্র বৈঠক বসায়। সেখানে পরদিন ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্রদের মধ্যে তখন এ বিষয়টি নিয়ে যারা বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন তারা হলেন এমএ বারী, ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ, আনোয়ারুল হক খান, আব্দুল মোমিন, আজম আলী, আহমদ রফিক প্রমুখ। সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে শেষ পর্যন্ত সমাধানের জন্য বিষয়টি ভোটে দেয়া গড়ায়। অধিকাংশ ভোটই ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে পড়ে। অলি আহাদ, আবদুল মতিন, শামসুল আলম ও গোলাম মাওলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মানে ১৪৪ ধারা ভাঙার সমর্থনে ভোট দেন। মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। অর্থাৎ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদেও বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা না ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে। ক্যাম্প্যাসে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের জন্য সারারাত ধরে গোপন প্রস্তুতি চলতে থাকে।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

সেদিন ছিল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন; ১৩৭১ হিজরির ২৪ জমাদিউল আউয়াল এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল আটটা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্ররা এবং ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে জমায়েত হতে থাকে। সকাল দশটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশও অবস্থান নিয়ে নেয়। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ছাত্রসভা আরম্ভ হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মত এম, আর,আখতার মুকুলের প্রস্তাবানুযায়ী গাজীউল হক সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শামসুল হক। তিনি ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে যুক্তি দেখান। পর বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ছাত্রদেরকে জোরাল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। পরিকল্পনা করা হয় যে আট বা দশজনের খন্ড খন্ড মিছিল বের করা হবে। মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুস সামাদ, আবদুল মতিনের নাম জানা যায় এই খন্ড মিছিলের পরিকল্পক হিসেবে। ভাষা আন্দোলনের অনেক নেতা-কর্মী এই পদ্ধতিতে ১৪৪ ধারা ভাঙাকে "সত্যাগ্রহ" বলেও অভিহিত করেছেন। মোহাম্মদ সুলতান বিশ্ববিদ্যালয় গেটে চলে যান - যাঁরা খন্ড মিছিলে বেরুবেন, তাঁদের নাম ঠিকানা লিখে রাখার জন্য। তাকে সাহায্য করতে আসেন হাসান হাফিজুর রহমান ও আজহার।

বেলা ১২টার দিকে দশজনী দলের প্রথম খন্ড মিছিল বেরোয়। কারো মতে প্রথম মিছিলটি নেতৃত্বে ছিলেন হাবিবুর রহমান শেলি, কেউ বলেছেন আজমল হোসেন। পরপর তিনটা মিছিল বেরোয়। তিনটা দলকেই পুলিশ তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে ট্রাকে তুলে নেয়। ছাত্রীরা বেরিয়ে এল চতুর্থ দল হিসেবে শাফিয়া খাতুনের নেতৃত্বে। সঙ্গে সুফিয়া আহমদ, শামসুন্নাহার আহসান, রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, মাহফিল আরা, সুরাইয়া, হালিমাসহ আরও অনেকে। পুলিশ মিছিল ঠেকানোর জন্য কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে আর লাঠিচার্জ আরম্ভ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠে। নিরুপায় হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পিছু হটে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই প্রোক্টর অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে পুলিশ কর্তাদের বেশ বাকবিতন্ডাও হয়। মুহুর্মুহু টিয়ার গ্যাস আর লাঠি চার্জেও পাল্টা প্রতিরোধ হিসেবে বিক্ষুদ্ধ উত্তেজিত ছাত্ররা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং বেপরোয়া হয়ে পুলিশের দেকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে। বেগতিক অবস্থায় বেপরোয়া হয়ে পুলিশ গুলি চালায়, ছাত্রদের লক্ষ্য করেই। এই গুলিতে বেশ কয়েকজন ছাত্র হতাহত হন।

অবশ্য কে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তা নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে। সম্ভবত রফিক (রফিক উদ্দীন আহমদ) প্রথম শহীদ। তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের আই.কম.-এর ছাত্র ছিলেন। একই সঙ্গে অথবা দ্বিতীয় শহীদ হন আবদুল জব্বার। গফর গাঁয়ের কৃষক সন্তান হোস্টেলে ছিলেন হাসপাতালে ভর্তি মাকে দেখাশোনা করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. কাসের ছাত্র আবুল বরকত উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। রাত আটটার দিকে তিনি হাসপাতালে শহীদ হন। পুলিশের গুলিতে অসংখ্য ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় লড়তে থাকেন। আহতদেও মধ্যে সচিবালয়ের পিওন আবদুস সালাম প্রায় দেড় মাস শয্যাগত থেকে ৭ এপ্রিল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে অন্তত তিনজন প্রাণত্যাগ করে শহীদ হন। এরা হলেন রফিক, জব্বার ও বরকত। আরও কয়েকজন শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের

পরিচয় ও সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

ছাত্রদের ওপর যখন গুলি চলে তখন মেডিক্যাল হোস্টেলের সন্নিকটস্থ পরিষদ ভবনে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠক চলছিল। স্পিকার আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের সদস্য মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে যখন দেশের ছাত্ররা পুলিশের গুলিতে জীবন দিচ্ছে তখন তাঁরা বসে বসে সভা করতে পারেন না। তর্কবাগীশের সঙ্গে কংগ্রেস দলের শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী, বসন্তকুমার দাস এবং শামসুদ্দীন আহমদ যোগ দেন। বিরতির পর আবার পর আবার বৈঠক বসলে তর্কবাগীশ সাহেব পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদ অধিবেশন বর্জন করে বাইরে বেরিয়ে যান। গুলিবর্ষণের ও ছাত্র নিহত হবার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পরপরই খুব দ্রুত দোকানপাট, গাড়ি ঘোড়া, অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায়। সচিবালয়ের বহু কর্মচারী বেরিয়ে আসেন। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের শিল্পীরা গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম ধর্মঘট করেন। এতে ওইদিন সন্ধ্যার পর থেকে সব প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। এই ধর্মঘটে কবি ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ প্রমুখ কবি শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরিষদ ভবন বর্জন করে তর্কবাগীশ সাহেব ছাত্র জনতার মধ্যে চলে আসেন। সেখান থেকে তিনি ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দান করেন। মাইক থেকে ঘোষণা করা হচ্ছিল যে পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে সে রাতেই মেডিক্যাল হোস্টেলের একটি কক্ষে আবদুল মতিন, অলি আহাদ, গোলাম মাওলা, এমদাদুল্লাহ প্রমুখ একটি জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বিলুপ্তির পর্যায়ে উপনীত হলেও তা ভেঙে দেওয়া ঠিক হবে না।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরেও বেশ সাফল্যেও সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট পালিত হয়। চট্টগ্রাম সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মাহবুবুল আলম ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হতাহতের খবর পেয়ে তৎণাৎ রচনা করেন একুশের প্রথম কবিতা "কাদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি"।

২২ ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী কয়েকদিন

২২ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর জানাজায় ইমামতি করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ঢাকার বাইরে চলে যাওয়ায় উপস্থিত লোকদেও মধ্য থেকে দাড়িওয়ালা একজন লোককে ইমামতি করার জন্য মনোনীত করা হয়। জানাজার পর একটি সংক্ষিপ্ত জনসভা হয়। ইমাদুল্লাহর সভাপতিত্বে তাতে অলি আহাদ বক্তৃতা করেন। সভা শেষে কয়েক হাজার জনতার এক বিশাল মিছিলে ঢল নামে। পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে। এতে ব্যর্থ হয়ে শেষে গুলিবর্ষণ করেন। গুলিতে হাইকোর্টেও কর্মচারী শফিউর রহমান রিকশাচালক আবদুল আওয়াল, রাজমিস্ত্রী হাবিবুর রহমানের ৮/৯ বছরের বালক অহিউল্লাহ শহীদ হন। অজ্ঞাতনামা আরো অন্তত দুজন শহীদ হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ওই দিন সন্ধ্যায় ব্যবস্থাপক পরিষদেও অধিবেশন বসে। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাকিস্তানের সংবিধান সভার উদ্দেশ্যে একটি সুপারিশ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মনোরঞ্জন ধর ও আনোয়ারা খাতুন সংশোধনী প্রস্তাব আনলেও তা নাকচ হয়। পূর্বদিনের মতো এদিনও বেশ কিছু তর্কবিতর্ক হয় যাতে বিরোধী দলের খয়রাত হোসেন, মুনীন্দ্রনাথ ভট্টচার্য, আলী আহমেদ, ভোলানাথ বিশ্বাস প্রমুখ যোগ দেন। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ওই দিনই পরিষদেও সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন।

ভাষা আন্দোলনের সাতজন শহীদের পরিচয় জানা যায়। অর্থাৎ অন্তত সাতজন নিঃসন্দেহে শহীদ হয়েছিলেন। এছাড়া নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি, এমন অন্তত আরো কয়েকজন শহীদ হয়েছিলেন। জানা সাতজন শহীদ হলেনঃ রফিকউদ্দীন, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত, শফিউর রহমান, আবদুল আওয়াল, অহিউল্লাহ এবং আব্দুস সালাম।

২৩ ফেব্রুয়ারি পূর্বদিনের মত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। এদিনের অন্যতম ঘটনা ছিল শহীদ মিনার নির্মাণ। ছাত্রদের উপস্থিত চিন্তার ফসল হিসেবে এক রাতের মধ্যে গড়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার। ২৪ ফেব্রুয়ারি শহীদ শফিউরের পিতাকে দিয়ে অনাড়ম্বর ভাবে মিনারটি উদ্বোধন করানো হয়। অবশ্য ২৬ ফেব্রুয়ারির দিন আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে দিয়ে দ্বিতীয়বার উদ্বোধন করানোর বিষয়টিও জানা যায়। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে দিকেই পুলিশ হামলা চালিয়ে একুশের প্রথম শহীদ মিনার ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়।

মোটামুটি এইভাবে এই অবস্থায় ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বের আপাত সমাপ্তি ঘটে।

রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ওই তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা। আর স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তিন (৩) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

শহীদ মিনার ও অন্যান্য

১৯৫৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বহু কাঙ্খিত শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। বরকত যে স্থানটিতে শহীদ হয়েছিলেন, সে স্থানটিতে পূর্ব বাংলা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মাতা একত্রে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা অবলম্বনে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে শহীদ মিনারটি নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। ভাস্কর্যের কাজ করেন নভেরা আহমেদ। কিন্তু আইয়ুব সরকারের সামরিক শাসন জারিতে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে গভর্নর আজম খানের সময় ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে অসমাপ্ত শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালে। ওই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম নির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭৩ সালে শহীদ মিনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। এর বছর দশকে পর মিনারের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে ১৯৮৩-৮৪ সালে শহীদ মিনারের সম্প্রসারণ ও সংস্কার সাধন করা হয়। তবে এখনও হামিদুর রহমানের মূল নকশার অনেককিছু বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৫২-র ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ মিনারটি ধ্বংস করার পর কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন সেই বিখ্যাত কবিতা "স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার"। একুশের অমর সঙ্গীত "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" রচনা করেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। এতে প্রথম সুর দিয়েছিলেন আবদুল লতিফ। পরবর্তীতে শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুর দেন। তার সুরেই এখন গানটি গাওয়া হয়। ০

ঢাকা

জানুয়ারী ২৫, ২০০২।

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে বিপা'র ভূমিকা

নাসিমা আক্তার

বিশ্বের দেশে দেশে আজ বাঙালী জাতির বসতি। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপনকারীর সংখ্যা দ্রুত স্ফীত। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে উত্তর আমেরিকায় ব্যাপকহারে বাঙালীর প্রবাস জীবনের সূচনা হয়েছে। বহু জাতি, ধর্মভাষা, বর্ণ ও গোষ্ঠীর এই সুবিশাল দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীর সংগ্রামে বাঙালীরাও সমান তালে অবতীর্ণ।

শিক্ষ-দীক্ষা-চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ মূলধারা রাজনীতির অংশীদার হওয়া ও এই সমাজ ও দেশে নিজের আসনটি পাকাপোক্ত করার ব্যাপারে তাদের সচেতনতা ও কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষণীয়। পাশাপাশি নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রয়াস ও প্রশংসার দাবী রাখে।

নতুন প্রজন্মের মাঝে আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিতে ইতিমধ্যে উত্তর আমেরিকায় শুরু হয়েছে বেশ কিছু উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও বিভিন্নস্থানে গড়ে ওঠা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠানগুলো এসব কর্ম প্রচেষ্টারই ফসল। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য এসব প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়ীত্ব লাভে সক্ষম হচ্ছে না। বিশেষ করে নিউইয়র্ক প্রথম বাংলাদেশ সোসাইটি বাংলা স্কুল চালু করে। যেহেতু সোসাইটি সকল বাংলাদেশীদের একটি সংগঠন স্বভাবতই প্রত্যাশা ছিল স্কুলটি স্থায়ীত্ব লাভ করবে এবং ধীরে ধীরে এর পরিধি বিস্তৃত হবে। কিন্তু বেশ কয়েকবার চালু করেও সোসাইটি স্কুল ধরে রাখতে পারেনি। লীগ অব আমেরিকাও একটি স্কুল করেছিল কিন্তু স্থায়ীত্ব ছিল না। প্রায় কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশ কালচারাল সেন্টার বাংলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্লাশ শুরু করে। সেন্টারের কর্মকান্ড কিছুদিন অব্যাহত থাকলেও বর্তমানে সেটি আর কার্যকর নয়।

পরবর্তী পর্যায় বা প্রায় একই সময়ে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস - বিপা, বাংলাদেশ কালচারাল একাডেমী, উদীচী, সদারং, রঞ্জনী, শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্রসহ আরো কয়েকটি স্কুল ও সংগঠন। এসব স্কুলের কোন কোনটি পূর্নাঙ্গ পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে শিক্ষাদান করে থাকে। আবার কোন কোনটি সেই পদ্ধতি অনুসরণ না করলেও বাংলা, সঙ্গীত নৃত্যসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

শুধু নিউইয়র্ক নয়- ডালাস, আটলান্টা, শিকাগো, মিশিগান, ওয়াশিংটন, বাল্টিমারসহ অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ স্কুল চালু রয়েছে।

সর্ব প্রথমে যে স্কুলটির নাম উল্লেখ করতে হয় অথবা যে স্কুলটি তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমেই ইতিমধ্যে সমগ্র উত্তর আমেরিকায় নতুন প্রজন্মের জন্য তথা সংস্কৃতি চর্চার সৃজনী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে সেটি হচ্ছে - নিউইয়কের বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফমিং আর্টস বিপা। সংগঠনটির জন্ম ১৯৯৩ সালে। দু'টি প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিপা একটি স্কুল শুরু করে ১৯৯৪ সালের গোড়ার দিকে। এক, এই প্রবাসে জন্মগ্রহণকারী ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশ ও তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যির সঙ্গে পরিচিত করানো; দুই, যারা দেশ থেকে নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাদের চর্চার অব্যাহত রাখার একটি প্লাটফর্ম তৈরী করা।

সূচনালগ্ন থেকে স্কুলটিকে একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বিপা কর্তৃপক্ষ বাংলা, সঙ্গীত, নৃত্যসহ বিভিন্ন শাখায় পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে বিপা বাংলাদেশের ছায়ানট, বুলবুল ললিত কলা একাডেমীসহ দেশের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যক্রমের অনুসরণে এবং গুনী শিল্পীজনের পরামর্শক্রমে ঐতিহ্যিক প্রথা ও শাস্ত্রীয় কাঠামো ভিত্তিতে তাদের পাঠ্যক্রম তৈরী করে। প্রাথমিক পর্যায়ের পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত এসব কোর্স শেষে পরবর্তী পর্যাযে রয়েছে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা। দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক, মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, দুই, বাংলা সঙ্গীতের মর্মার্থ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা।

হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু হলেও প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে বিপা সাফল্যের আটটি বছর অতিক্রম করেছে। প্রতি শুক্র ও রোববার দু'দিন করে স্কুলের কাশ হয়। চূড়ান্ত পরীক্ষাসহ বছরে ৪টি পরীক্ষা নেয়া হয়। চূড়ান্ত পরীক্ষার পর সকল পরীক্ষার ফলাফলের গড় হিসেব করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়। সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে বিচারক আনা হয়। এছাড়াও স্থানীয় ইংরেজী স্কুলের ন্যায় সকল শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে সকল বিষয়ের ভিত্তিতে 'শ্রেষ্ঠ' ও 'অনন্য' নির্বাচিত করা হয়। এক্ষেত্রেও সমাজের একজন গুনীজনকে পরীক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। বিপা ও ইংরেজী স্কুলের ফলাফল, উভয় স্কুলের বিভিন্ন অনুশীলন ও কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ ও পরীক্ষকের নেয়া ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ ও অনন্য নির্বাচিত করা হয়।

বিপা প্রতিবছর বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে নিজস্ব প্রযোজনায় দু'টি নৃত্যনাট্য উপস্থাপন করে এবং মূল ধারায় নিয়মিত অংশ নিয়ে নিজের আসন বেশ পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। নতুন সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু হলেও সুধী মহলে এনিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং দৈনন্দিন জীবনে বাংলার নিস্প্রভ উপস্থিতি এই শ্রেণীর মতের প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

অর্থনীতির মূল্য বিচারে নেতিবাচক ফলাফল হলেও সামাজিক কাঠামোয় বাংলার প্রয়োজনীয়তা আজ বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বহু জাতির এই সংস্কৃতির মিলন মেলায় আপন শেকড়ের সন্ধান ও আত্মপরিচয় নিয়ে অংশীদার হওয়ার অনিবার্যতা কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে অপর পক্ষে অভিমত। মতামত যাই থাকুক উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা চলছে আপন গতিতে। বাঙালী আমেরিকান হয়ে এই সমাজে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর জন্য আপন সংস্কৃতি, ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা আজ অস্বীকার করার উপায় নয়। এভাবেই আগামী প্রজন্ম জানবে তাদের ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতিকে। জানবে তাদের ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় ইতিহাসকে। স্কুলগুলি যেভাবে গড়ে উঠছে এবং কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তাতে একদিন প্রবাসে বাঙালী সংস্কৃতি চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

প্রবাসে অন্যান্য স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম ও কার্যক্রম সম্পর্কে ভবিষ্যতে আপনাদের জানানোর ইচ্ছা রইলো। ০

নিউ ইয়র্ক
জানুয়ারী ২৬, ২০০২।

বাংলা শিক্ষা ও প্রবাসী প্রজন্ম

পারভীন আক্তার

আমরা যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, মাঝে মাঝে যখন পুরোপুরি অন্য ভাষার দেয়ালে আটকে থাকি, তখন অন্তরের গভীর থেকে অনুভব করি, মায়ের ভাষাটি কত মধুর এবং কত তৃপ্তি, শান্তি আর ভালবাসা এতে মিশে আছে। পরক্ষণেই যদি চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি, ওদের দিকে যারা আমাদের উত্তরসুরী, অস্তিত্ব, আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক - তাদের কাছে আমরা কি তুলে দিয়ে যাচ্ছি? আমরা কি তাদের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছি সে বার্তাকে। নির্দ্বিধায় এখানেই আমাদের কণ্ঠের বলিষ্ঠতা কম। এ প্রশ্ন আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে।

আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে আমরা কি শেখাবো, কেন শেখাবো বলতে গেলে প্রথমেই দেখা প্রয়োজন তারা কি শিখছে - আর কি শেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। যারা শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো নির্ধারণ করে থাকেন তারা অতি সুচারুভাবে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে একটা গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে যে পথটা তা নির্ধারণ করে থাকেন। যাকে আমরা বলি কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম। আমি একজন শিক্ষিকা হিসেবে পৃথিবীর দু'প্রান্তের দুটো শিক্ষাক্রমকেই খুব কাছে থেকে দেখে যা অনুভব করি, তাহলো প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থায়ই তাদের সাধ্যানুসারে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বৃত্তিগুলোকে উন্মোচন করা ও বিকশিত করে তোলার সর্বোত চেষ্টা সচেতনতার সাথে করা হয়ে থাকে। সে কারণে ধরুন আপনি কানাডা অথবা আমেরিকাতে আপনার ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি অবশ্যই একজন গর্বিত মা-বাবা কেননা আপনার সন্তান বিশ্বের সর্বাধুনিক ও উন্নতমানের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তবে যদি আরও সূক্ষ্মভাবে বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের সন্তানেরা তাদের জীবনের একটা বড় অংকের সময় যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িয়ে আছে সেখানে কিন্তু তাদের আত্ম-পরিচয়ের কোন সুযোগ নেই, তাদের জানার সুযোগ হচ্ছে না যে আমাদের একটা গৌরবময় পরিচিতি আছে। এ কারণেই তাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক 'আমরা জলে ভাসা পদ্ম'ই মাত্র। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় বন্ধন, আত্মার বন্ধন যে কত দৃঢ়, কত উর্ধ্বে তা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি আমার বাংলা স্কুলে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রায় চল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটা প্রজেক্ট করতে দিয়েছিলাম। বিষয়টি ছিল 'বাংলার মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা কি এবং কেন?' দেখা গেছে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই জাতীয় চেতনা যথেষ্ট উন্নত, তবে দুঃখজনক হলেও ওদের মধ্যে হাতেগোনা দু'একজনই জানে - কেন উন্নত, বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীই বলেছে, 'একুশে ফেব্রুয়ারিতে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল'; হতাশাজনক হলেও এটাই সত্যি। মূল বিষয়টি হলো আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবধানে আমাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাদের সন্তানদের কাছে পৌঁছতে পারছে না।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধারও পার্থক্য হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবের রিয়াদে আমি যে বাংলা স্কুলে পড়াতাম, যে স্কুল, ছাত্র-ছাত্রী আমার মনের প্রতিটি কোণে গেঁথে রয়েছে - সেখানকার কথা না লিখে পারছি না। এখানে এসে কানাডিয়ান শিক্ষা ব্যবস্থাকে রপ্ত করতে কত না গবেষণা, শিক্ষানীতি, শিক্ষাদানের পরিকল্পনা ও কায়দা-কানুন শিখতে হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি যখন সুসজ্জিত, উন্নত এ ক্লাসরুমে পৃথিবীর নানা দেশের ছেলেমেয়েদেরকে পড়িয়ে ঘরে ফিরি তখন মনে হয় 'কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা-মেটে কার জলে'। যা হোক যে প্রসঙ্গে বলছিলাম। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, রিয়াদে বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমেই লেখাপড়া শেখানো হয়। একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে হলেও প্রতিটি ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে মনে হত - প্রতিটি প্রাণ যেন শেকড় থেকে জেগে উঠছে, জাতীয় দিবসগুলিতে পিঠার মেলা, চিত্ত-চেতনামূলক গানের অনুষ্ঠান এখনও চোখে ভাসে।

আমরা যারা আমেরিকা ও কানাডাতে আছি, আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলা শেখানোর সুযোগ পাচ্ছি। বাংলা স্কুলে ছেলেমেয়েরা বাংলা লেখা ও পড়ার মাধ্যমে দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি অনেক কিছুর সাথেই পরিচিত হতে পারে। টরোন্টোতে বাংলা স্কুলের অবস্থা হল অনেকটা এরকমের 'মুকুটটাতো পড়েই আছে রাজাই শুধু নেই।' রাজা হবার সম্ভাবনা নেই বলেই মুকুটটা পড়ে আছে অর্থাৎ কোন ক্রেডিট পাবার ব্যবস্থা নেই বলেই অনেকেরই স্কুলে আসার ইচ্ছাটা তেমন নেই। এ সমস্যা উত্তর আমেরিকার অন্যান্য শহরে থাকাও বিচিত্র নয়, যদিও তা আমার পুরোপুরি জানা নেই। সেকেন্ডারী স্কুলে ক্রেডিট পাবার ব্যবস্থা থাকলেও কমিউনিটির সক্রিয় চেষ্টার অভাবে তা এখনও পুরোপুরিভাবে শুরু হয় নাই। ক্রেডিট কোর্সটা চালু হলে বাংলা স্কুলগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হতে পারতো।

এছাড়াও বাংলা স্কুল সবার কাছেই অনেকটা 'অতিরিক্ত' বা 'কৃত্রিম' হিসেবে গণ্য হচ্ছে। প্রথমেই আসছি পরিবেশ প্রসঙ্গে চার দেয়ালের বাইরে বাংলার পরিবেশ পাওয়ার তো অবকাশই নাই, শ্রেণীকক্ষের ভিতরেও বাংলা স্কুলের মত করে সাজানো গোছানো সম্ভব হয় না অথচ উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইটালীর রেজিও এমিলিয়া শহরে শ্রেণীকক্ষকে 'দ্বিতীয় শিক্ষিকা' হিসেবে মনে করা হয়। আর আমাদের স্কুলের জন্য আমরা যে শ্রেণীকক্ষটিতে পড়াই তা পুরোপুরি নিয়মিত স্কুলের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে সাজানো গোছানো। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি হল নিয়মিত স্কুলের সবকিছু সেরে যদি হাতে সময় থাকে তখন বাংলা স্কুল।

অভিভাবক-অভিভাবিকারা তাদের রাশি রাশি কর্তব্য কর্মের অবিরাম আকর্ষণ ও বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে বাংলা স্কুলে ছেলেমেয়েদেরকে পাঠানোর তাগিদটা অতটা গুরুত্ব সহকারে নেন না। অনেকাংশ শিক্ষাদান পদ্ধতিও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নিয়মিত স্কুলের সহজতর, ধারাবাহিক ও সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা শিক্ষা পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েরা পার্থক্য খুঁজে পায়। যার জন্য সবকিছু থেকেও একটা 'না বোধক' অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্যবিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি - প্রতি মাসে বোর্ড থেকে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপরে আমরা লেসন প্ল্যান তৈরি করে থাকি। এই গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের বিষয়বস্তু ছিল 'সেলিব্রেশন' উৎসব। ঈদ আমাদের একটা সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান অথচ ঈদ পড়াতে গিয়ে তেমন কোন গান, গল্প, ছড়া, বই অথবা অডিও-ভিডিও খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাহলে কি দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিষয়বস্তুটাকে উপস্থাপিত করবেন সুন্দরভাবে।

এরপরেও দেখা যায়, ছেলেমেয়েদের অনেকেরই একটা অদৃশ্য আর্কষণ রয়েছে এ স্কুলের সাথে। শত শত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও অভিভাবক-অভিভাবিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অশেষ আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্কুলগুলি চলছে। যদিও মাঝে মাঝে গুলিস্তানের বাসের মত ধাক্কা দিয়ে দিয়েও চালু রাখতে হয়।

ঘরই হচ্ছে প্রথম শিক্ষাঙ্গন। মানুষের প্রথম বিশ্বাস ও অভ্যাসের শিক্ষাটা ঘর থেকেই শুরু হয়। এই বিশ্বাস ও অভ্যাসের ভিত্তিটা যদি মজবুত হয় তাহলে তা সহজেই পরিবর্তিত হয় না। তাই অভিভাবক-অভিভাবিকা বা মা-বাবার দায়িত্ব হচ্ছে সর্বপ্রথম তারা তাদের নিত্যদিনের কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই ছেলেমেয়েদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। ছেলেমেয়েদের আগ্রহ ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে খুব সহজ, সরল, সাধারণ ভাষায়, অর্থবহ চিত্র সহ বইয়ের ব্যবস্থা করলে তাদের উদ্দীপনা বাড়বে। প্রচার মাধ্যমগুলি বিষয়টির বিশেষত্ব সমাজের সামনে জোরালো ভাবে তুলে ধরলে অনেকেরই টনক নড়বে। সিনিয়র স্কুলের ক্রেডিট কোর্সটা চালু করলে অভিভাবকেরা অনায়াসেই এগিয়ে আসবেন।

সবশেষে বলব, পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে। আমাদের সৃষ্ট এ পথটি যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপস্থিত ও অনাগত অনুসারীদের জন্য সুগম হয়। আমরা যেন সমস্ত দীনতা-হীনতাকে উপেক্ষা করে মা, মাটি আর ভাষাকে জন্ম জন্মান্তরের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারি। o

টরন্টো, কানাডা
জানুয়ারী ১২, ২০০২।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রস্তাবকের একান্ত সাক্ষাৎকার

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩০তম পূর্ণাঙ্গ সাধারণ সভায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বাংলা ভাষা আন্দোলনের দুই শহীদ রফিক ও সালামের নামেই কানাডার ভ্যাঙ্কুভারস্থ অন্য দুইজন ভাষা প্রেমিক রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এই দিবসটির স্বীকৃতি আদায়ে সীমাহীন পরিশ্রম করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম, কানাডার বহুভাষী ও বহুজাতিক সংস্থা 'দ্যা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড'-এর সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রস্তাবক। জন্ম ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরের গণিলজ রাজবাড়ীতে। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার ছোট ভাই শহীদ সাইফুল ইসলাম (সাফু) মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে শহীদ হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিষয়ে জনাব ইসলাম এম.কম. পাশ করেন ১৯৮০ সালে। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি সপরিবারে কানাডার অভিবাসী হিসেবে ভ্যাঙ্কুভারে বসবাস শুরু করেন। রফিকুল ইসলাম ও বুলি ইসলাম দম্পতির দুই পুত্র সন্তান। ভ্যাঙ্কুভারে তাদের ব্যবসা রয়েছে এবং একই সঙ্গে ইসলাম দম্পতি নানা সমাজকর্মে নিজকে যুক্ত রেখেছেন। বর্তমানে তিনি 'ঘুষ ও অন্যান্য উপার্জন মুক্ত বাংলাদেশ ফোরাম'-এর সাথে জড়িত এবং তার লেখা 'ঘুষ ও অন্যায় উপার্জনমুক্ত বাংলাদেশ' নামে পাণ্ডুলিপিটি শেষের পথে, গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষ থেকে রফিকুল ইসলাম সস্ত্রীক প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে ২০০০ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের জন্য আমন্ত্রিত হন এবং যোগদান করেন। বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের 'একুশে পদক' যে ১১ জন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করেছেন, তার মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কানাডীয় সংগঠন 'মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড'ই ছিল একমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠান। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকারের মিনিস্ট্রি অব কালচারাল এ্যাফেয়ার্স, কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে পত্রযোগে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিতব্য একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এই সংগঠনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে একুশে পদক গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, পদকপ্রাপ্ত প্রত্যেককে নগদ ৪০ হাজার টাকা সহ ৩ ভরি ওজনের ১৮ ক্যারেট সোনার পদক ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হবে। ভ্যাঙ্কুভারের যেখানে থেকে জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এ দিবসটি বাস্তবায়নে যোগাযোগ রচিত হয়েছিল, সেখানে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে সম্প্রতি পড়শী'র পক্ষ থেকে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হই।

পড়শী: বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু এই মাতৃভাষার মর্যাদাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের যে চিন্তা, সেটা আপনার কিভাবে এলো?

রফিকুল ইসলাম: ১৯৯৫ সালে কানাডায় এসে প্রথম থেকে আমি ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রভিন্সের এই ভ্যাঙ্কুভারেই বসবাস শুরু করি। এ শহরটি মাল্টিকালচারের জন্য খ্যাত। সেই সুবাদে কানাডার বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়। মাতৃভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কানাডাতেই এর সংখ্যা প্রায় ৭৯টি। বর্তমানে ৭৬টি মাতৃভাষা জীবিত আছে, ৩টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কিছু ক্ষুদ্র মাতৃভাষা আছে, যেমন TUSCARORA ভাষা, কানাডাতে এ ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ৭/৮ জন। সমগ্র বিশ্বে এ ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০০০ জন, তার মধ্যে উত্তর আমেরিকাতে রয়েছে মাত্র ৩০ জন। এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাষাগুলি যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয়, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ওই জাতির নিজস্ব ভাষা হারিয়ে যেতে পারে। তাই আমার মনে হয়েছে, ছোট হোক বড় হোক, বিশ্বের সকল জাতির নিজস্ব মাতৃভাষাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সম্মান দেখানো যায়, এর একটা পথ বের করা দরকার।

পড়শী: মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য আপনি প্রাথমিকভাবে কি প্রচেষ্টা চালালেন?

রফিকুল ইসলাম: মাতৃভাষাগুলো যাতে পৃথিবী থেকে হারিয়ে না যায়,

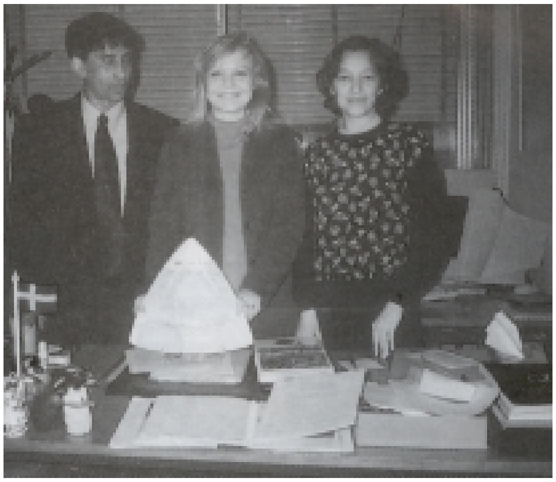

ইউনেস্কোতে রফিকুল ইসলাম, আন্না মারিয়া মাইলফ ও এলিজাবেথ

বিশ্বব্যাপী যাতে মাতৃভাষা গুরুত্ব পায়, তার জন্য আমি প্রথম ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একটি নির্দিষ্ট দিনকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেবার জন্য আবেদনপত্র পাঠাই। পত্রে আমি উল্লেখ করি, বাঙালীরা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি জীবন দিয়ে তাদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। মাতৃভাষার জন্য আত্মাহুতি দেয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা বিরল ঘটনা। সুতরাং ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা যায় কিনা, তা বিবেচনার জন্য আমি অনুরোধ করি।

পড়শী: জাতিসংঘ এর উত্তরে আপনাকে কি জানালো?

রফিকুল ইসলাম: দুই সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর এলো। উত্তর লিখেছিলেন অফিসার ইনচার্জ, পাবলিক ইন্‌কুয়ারীজ ইউনিট ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনফরমেশন-এর হাসান ফেরদৌস, ভদ্রলোক বাঙালী। তিনি লিখলেন, জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী এই সংস্থা কোন ব্যক্তির আবেদন বিবেচনায়

নিতে পারে না। আবেদন আসতে হবে জাতিসংঘের যে কোন সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে।

পড়শী: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য কি করলেন?

রফিকুল ইসলাম: রাষ্ট্র পর্যায়ে আমার তেমন জানাশোনা ছিল না। তখন আরেক বাংলাদেশী আবদুস সালামের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করি। আমাদের এ আন্দোলনে তার অবদানও অসামান্য। তারপর অন্য ভাষাভাষী আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলি। সবাই উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সায় দেয়। এই পর্যায়ে আমরা নিজেদের সংঘবদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবে সাতটি ভিন্ন ভাষাভাষীর ১০ জন সদস্য নিয়ে 'দ্যা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' (The Mother Language Lovers of the World) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। এই সংগঠনের মাধ্যমেই পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করি।

পড়শী: সাতটি ভাষাভাষী সদস্যের মধ্যে কি কি ভাষা ছিল?

রফিকুল ইসলাম: আবদুস সালাম ও আমি ছিলাম বাংলা ভাষী; দুইজন ইংরেজি, দুইজন ফিলিপিনো, ১ জন হিন্দী, একজন জার্মান, একজন চীনের ক্যান্টলিজ ভাষাভাষী এবং ভারত-পাকিস্তানের কিছু কিছু এলাকার জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা কাচিছ ভাষী একজন।

পড়শী: আপনারা এ সংগঠন নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হন?

রফিকুল ইসলাম: এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আবার ২৯শে মে ১৯৯৮ সালে ১০ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত সেই একই প্রস্তাব জাতিসংঘে পাঠাই। উত্তরের দেরী দেখে হাসান ফেরদৌসকে ফোন করি। তিনি আমাদের খুব একটা কার্যকরী পরামর্শ দিলেন। বলেন, এসব বিষয় বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো।

পড়শী: ইউনেস্কো কি জানালো?

রফিকুল ইসলাম: আন্না মারিয়া মাইলফ তখন ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট। ৩রা মার্চ ১৯৯৯ সালে আমি তার সঙ্গে কথা বলি। ভদ্রমহিলা আমাদের প্রস্তাব পেয়ে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করে ওই দিনই আমাকে ফ্যাক্স পাঠান। তিনি বলেন, "এই চিন্তাধারাটা খুবই চমৎকার। আমরা তোমাদের এ প্রস্তাবটা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে তোমার সাথে যোগাযোগ করবো।"

পড়শী: তারপর আন্না মারিয়া আবার কি জানালো?

রফিকুল ইসলাম: ৪ঠা এপ্রিল আন্না মারিয়া আমাকে দ্বিতীয় ফ্যাক্স পাঠায়। ফ্যাক্সে তিনি পাঁচটি দেশের নাম এবং তাদের ইউনেস্কো অফিসের ঠিকানা দিয়ে ওই সব দেশকে আমাদের প্রস্তাব জাতিসংঘের ইউনেস্কোকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপনের অনুরোধ জানানোর জন্য বললেন। দেশ পাঁচটি হচ্ছে কানাডা, ভারত, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী এবং বাংলাদেশ।

পড়শী: আপনারা কবে আন্তর্জাতিকভাবে যোগাযোগ শুরু করলেন?

রফিকুল ইসলাম: আমরা ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই পাঁচটি দেশের ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোকে আমাদের প্রস্তাবসহ চিঠি দিলাম। চিঠিতে এও জানালাম, আমাদের প্রস্তাব আসন্ন ইউনেস্কো জেনারেল এসেম্বলির অধিবেশনে উত্থাপন করবো এবং ডেডলাইন ১০ই সেপ্টেম্বর।

পড়শী: এ প্রস্তাবে প্রথম কোন দেশ সাড়া দিয়েছিল?

রফিকুল ইসলাম: যদিও একই সময়ে আমরা এই পাঁচটি দেশে চিঠি পাঠিয়েছি, হাঙ্গেরীর কাছ থেকে প্রথম সাড়া পেলাম ১৬ই আগস্টে।

পড়শী: আর বাংলাদেশ?

রফিকুল ইসলাম: আমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম বাংলাদেশ থেকে উত্তরের আশায়। দেরী দেখে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রকীব উদ্দীন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বুঝতে পারি, তারা আমাদের চিঠি তখনও পান নাই। আমি সেই দিনই চিঠির আরেকটা কপি ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দেই। চিঠিটা শিক্ষামন্ত্রী পেয়ে সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনেন। তিনি বিষয়টা শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তঃমন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নেবার জন্য নির্দেশ দেন। তবুও বাংলাদেশ থেকে চিঠি পাঠাতে দেরী হচ্ছিল। এমন কি এক পর্যায়ে সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের পরও প্রস্তাবটি প্যারিসে পাঠানোর আগে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর যখন প্রয়োজন, তখন তিনি জাতীয় সংসদে ছিলেন। বিষয়টি জেনে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তক্ষুণি প্রস্তাবটি প্যারিসে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে অবশেষে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে (ডেড লাইনের আগের দিন) ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর প্যারিসের সদর দপ্তরে এসে পৌঁছায়।

পড়শী: সে সময়ে আপনি বাংলাদেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে কি ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করেছেন?

রফিকুল ইসলাম: আমাদের দেশের কূটনীতিকরা এখন অত্যন্ত প্রফেশনাল এবং খুবই উঁচু মানের কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। প্যারিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, ইউনেস্কো মহাসচিবের সিনিয়র এডভাইজার তোজাম্মেল হক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর সচিব প্রফেসর কফিলউদ্দীন আহমদ, প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর ইস্তিয়াক চৌধুরী এবং শিক্ষামন্ত্রীও প্যারিসে যেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তাদের আন্তরিক তৎপরতার জন্য আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে একই সঙ্গে আরও ২৯টি সদস্য রাষ্ট্রের স্বাক্ষর আদায় করেন। এমনকি তারা আমাদের প্রস্তাবটির সহ-প্রস্তাবক হতেও সম্মত হয়। এদের মধ্যে পাকিস্তানও ছিল।

পড়শী: প্রস্তাবটি কিভাবে ইউনেস্কোর জেনারেল এসেম্বলিতে উত্থাপিত হয়েছিল?

রফিকুল ইসলাম: ১৯৯৯ সালের ২৬শে অক্টোবর থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত ইউনেস্কোর ৩০তম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সম্মেলন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে শিক্ষামন্ত্রির নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সে সম্মেলনে যোগ দেয়। তখন আমি নিজেও খুবই উৎকণ্ঠার সাথে ঘন ঘন প্যারিসের সাথে যোগাযোগ রেখেছি। আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয় ১৭ই নভেম্বর অধিবেশনের শেষ দিনে। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর সচিব প্রফেসর কফিলউদ্দীন আহমদ প্রস্তাবটি পেশ করেন। সেদিনই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রের কেউই এ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেনি।

পড়শী: এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে দেশী ও প্রবাসী বাঙালীদের জন্য আপনার কোন বক্তব্য আছে কি?

রফিকুল ইসলাম: আমরা আজ আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্ব পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছি। বর্তমানে বাংলা সহ আমাদের দেশে ৪১ রকমের মাতৃভাষা আছে। এ ভাষাগুলো যথাযথভাবে রক্ষা করা দরকার। গত ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিল। সেটা যদি বাস্তবায়িত হতো, তবে দেশ ও জাতির জন্য একটা বড় মাপের কাজ হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মডার্ণ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট আছে। নিদেন পক্ষে, সেখানেও বাংলা সহ অন্যান্য মাতৃভাষার গবেষণা, সংরক্ষণ ও ভাষা যাদুঘর করা যায় বলে আমার বিশ্বাস। ০

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : আমিনুল ইসলাম মওলা।

ভ্যাংকুভার, কানাডা

জানুয়ারী ১০, ২০০২।